সহজ পাঠ

অচিন্ত্য দাস

কতদিন আগের কথা আমাদের মনে থাকে? বলা হয়, পাঁচ বছর বয়স বা তারপর থেকে। কথাটা হয়ত ঠিক, কারণ মনে আছে যে, আমার একটা বই ছিল ঃ রঙটি ঘিয়ে ঘিয়ে পাটকিলে ধরনের। মাঝখানে সবুজ অক্ষরে লেখা 'সহজ পাঠ'। নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখা ছিল কিনা, ঠিক মনে নেই বইটার আকার চৌকোণা গোছের, অন্য বই-এর সঙ্গে ঠিক খাপে কাপে কচ্ করে রাখা যেত না। ব্যাগের মধ্যে রাখার সময় তাই মলাট ঘষে যেত। স্পষ্ট মনে পড়ে, বইটার চৌহদ্দি ছেঁড়া ছেঁড়া- ব্যাগের সঙ্গে মলাটের ঘষাঘষির ফল। ইস্কুলের বুক-লিস্টে ছিল কি না কে জানে, তবে খুব সম্ভবত 'সহজ পাঠ' ক্লাসে পড়ানো হতো না। তবু সেই ব্যাগে থাকত। আমার সঙ্গে ইস্কুলে যেত আবার ফিরে আসতো।

'সহজ পাঠ' এর চারটি ভাগ আছে - প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। যে বইটি আমাদের কাছে ছিল, সেটা কোন্ ভাগ তা একটুও মনে নেই। থাকার কথাও নয়। ওই বয়সে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। জামসেদপুর বইমেলায় বিশ্বভারতীয় স্টলে চারটে বিভিন্ন রঙের 'সহজ পাঠ' সাজিয়ে রাখা ছিল। আমি একটা একটা করে বই দেখতে শুরু করলাম। দ্বিতীয় ভাগ উল্টে পাল্টে দেখতে গিয়ে হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। একটা ল্যাজকাটা কুকুর, ভাঙা মন্দিরের দালানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বলে উঠলাম ঃ ''এ কি, তুই এখনো এখানে! কেন আছিস রে?'' সে বলল - ''আরে তুই, এতদিন পরে! আমি তো এখানেই আছি, তুই-তো চলে গিয়েছিলি...।

মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, আমার কাছে ছিল 'সহজ পাঠ' -এর দ্বিতীয় ভাগ-

অঞ্জনা নদী - তীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল - ধরা এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।
আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর
আছে এক লেজ - কাটা ভক্ত কুকুর।

কবিতাটি আছে দ্বিতীয় ভাগের শেষে। আবছা মনে আছে, সকলে বলত, এই কবিতাটি শুনলেই আমি নাকি ঘুমিয়ে পড়তাম। তাই হবে - এই ছ'টা লাইন দেখলাম মনে আছে। তারপর হয়ত সত্যিই ঘুমিয়ে পড়তাম। কবিতাটির মধ্যে বেশ একটা ছন্দের দুলুনি আছে। সব শব্দের সঠিক মানে বুঝতে না পারলেও কবিতার কথা শিশুমনে ছবি তৈরি করে - নইলে এতযুগ পরে লেজ-কাটা কুকুরটিকে চিনতে পারে কি কেউ?

এই সব ভাবতে ভাবতে 'সহজ পাঠ' (দ্বিতীয় ভাগ) হাতে তুলে নিলাম। আমাকে 'সহজ পাঠ' নিতে দেখে বিক্রেতা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, চারটে ভাগই বরং নিয়ে যান, পরে হয়ত আর পাবেন না। নিয়ে নিলাম। সামান্য দাম, বিক্রির দিক থেকে এর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই - তবু মনে হলো বিক্রেতা ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হয়েছেন। 'সহজ পাঠ' হয়ত ওনারও প্রিয় বই।

ছেলেবেলাকার স্মৃতির মধ্যে একটা মাধুর্যের ভাব থাকে। তাই বাড়ি এসে 'সহজ পাঠ' খুলে বসলাম। প্রথম ভাগ চেনা চেনা মনে হলেও দ্বিতীয় ভাগের মতো অত পরিচিত মনে হলো না। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ আগে কখনো পড়িনি, ওই প্রথম খুলে দেখলাম। এই দুটি ভাগ রবীন্দ্রনাথের রচনা বলা চলে না - এর মধ্যে আছে তাঁর সম্পাদিত এবং সংকলিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি। গোটা কতক গান ও কবিতা ছাড়া প্রায় সব রচনাই অন্য লেখকের।

সেই থেকে প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগ বার পাঁচেক পড়া হয়ে গেল। 'সহজ পাঠ' -এ বাংলাভাষা শেখার আয়োজনের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে - আজকের এই কম্পিউটার - কার্টুন - ইংরেজি ছড়া অধ্যুষিত প্রাথমিক শিক্ষার জগতে 'সহজ পাঠ' -এর দু-চারটে সহজ কথা এখনো প্রাসঙ্গিক হতে পারে। প্রাসঙ্গিকতার কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, 'সহজপাঠ' পড়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা অনাবিল আনন্দ আছে। তাছাড়া 'সহজ পাঠ' -এর সহজ আলোচনার মধ্যে নানান যে সব বিষয় এসে পড়ে, তার বৈচিত্রও কিছু কম নয়।

'সহজ পাঠ' -এর প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৩৭ অর্থাৎ কিনা আজ থেকে সাতাত্তর বছর আগে। প্রথম ভাগ তিপান্ন পাতার বই, এর প্রথম দিকটায় প্রতি পাতায় ছবি। শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা, সব ছবিই কালো কালিতে। চিত্রশিল্পের দিক দিয়ে এসব ছবির মধ্যে হয়ত অনেক গুণ আছে, তবে সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে দেখলে প্রশ্ন একটা থেকে যায়। এসব ছবি কি শিশুদের তেমন আকর্ষণ করে? দ্বিতীয় ভাগ ষাট পাতার বই, এতেও অনেক ছবি আছে। তবে এসব ছবির ধরন অন্য। বই-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ''সমস্ত ছবিই শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের আঁকা। শিশুরা নিজে নিজে ছবিগুলি রঙ করে নিতে পারবে বলে সেগুলি রেখায় আঁকা হয়েছে। এতে বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা ছবি আঁকার আনন্দও পাবে।'' রঙ ভরে দেওয়ার মতো ছবি ছাড়াও দ্বিতীয় ভাগে কিছু পেনসিল স্কেচ আছে। অনেক দিন আগে প্রকাশিত বই - আজকালকার দিন হলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় রঙিন কিংবা আরও আকর্ষণীয় ছবির ব্যবস্থা করতেন। মজার কথা হলো, নন্দলাল বসুর ছবিগুলি সবসময় যে সঙ্গের রচনাটিকে হুবহু অনুসরণ করছে, তা নয়। ''তিনটে শালিখ ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে'' -এই কবিতাটির ওপরে দুটো শালিকের ছবি - আর তারা যথেষ্ট শান্তভাবেই বসে আছে। একাদশ পাঠে বাঘ শিকারের যে গল্প আছে, সঙ্গের ছবিটির বাঘশিকার সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

অলঙ্করণের দিক থেকে 'সহজ পাঠ' -এর একটা ভিন্নতা, একটা নিজস্বতা আছে ঠিকই, তবে তা নেহাৎ উপরিতলের বৈশিষ্ট্য। 'সহজ পাঠ' -এর আসল বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি চোখে পড়েছে লেখাগুলি বারবার পড়তে পড়তে।

প্রথম ভাগটি খুলে পড়তে শুরু করলেই, এই বই যে একজন কবির রচনা, তা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। যেমন স্বরবর্ণ শেখানোর জন্য ঃ

''অ এ অজগর আসছে তেড়ে - আ এ আমটি খাব পেড়ে।'' এই প্রচলিত ছড়াটির বদলে 'সহজ পাঠ' -এর প্রথম পাতায় আছে- ''ছোটখোকা বলে অ আ, শেখেনি সে কথা কওয়া।'' এর ছন্দ, এর ভাব, এর মাধুর্য মানতেই হয় 'অজাগর আসছে তেড়ে'র থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে। এই সব পাঠ কিছু গদ্যে, কিছু পদ্যে। যা গদ্যে লেখা, তার মধ্যেও কবিতার ছোঁয়া লেগে থাকে। যেমন - দ্বিতীয় পাঠ থেকে - ''পথে কত লোক চলে। গরু কত গাড়ি টানে। ঐ যায় ভোলা মালী। মালা নিয়ে ছোটে। ছোট খোকা দোলা চ'ড়ে দোলে।'' গদ্যে লেখা হলেও এর মধ্যে একটা ছন্দের চলন আছে। একটা কবিতা - কবিতা ভাব ঈথার - তরঙ্গের মতো ভেসে বেড়ায় যেন। আর যেখানে তিনি ছন্দে লিখেছেন, সেখানে তো কথাই নেই। প্রথম ভাগের পঁচিশ পৃষ্ঠা থেকে - ''তারাগুলি নিয়ে বাতি / জেগে ছিল সারা রাতি/ নেমে এল পথ ভুলে/ বেল ফুলে জুঁই ফুলে।''

সাড়ে চার - পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে একটু বেশি কাব্যিক মনে হয় যেন! আরও দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে, যেমন একত্রিশ পৃষ্ঠায় - ''ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি/ আছে আমাদের পাড়াখানি।'' এ কবিত্ব শিশুর মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে- অন্তত সাধারণ মেধার শিশুদের ক্ষেত্রে। তবে পঞ্চম পাঠের 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটি বেশ শিশুসুলভ। এই রচনাটির সঙ্গে, মনে পড়ে গেল, একবার দেখা হয়েছিল হাই - স্কুলের বাংলা ব্যাকরণ ক্লাসে। বাংলায় নানান অর্থে জোড়া শব্দের ব্যবহার হয়। এটি বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন - বড় বড় বাড়ি। এখানে জোড়া শব্দ বহুত্ব এবং পরিমাণ বোঝাচ্ছে। অনেকগুলো বেশ বড় ধরনের বাড়ি। কিন্তু যখন কেউ বলে - মুড়িটা ঝাল ঝাল করে মাখিস্ - তখন জোড়া শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ ঝাল অথবা ঝালের আভাস। ব্যাকরণে এই প্রয়োগকে শব্দদ্বিত্ব বলা হয়েছে। 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা শব্দদ্বিতের অনেকগুলো উদাহরণ আছে। এই সুবাদেই এই সহজ সরল ছোট্ট কবিতাটি কারক - বিভক্তি - সমাস কন্টকিত বাকরণ ক্লাসে ঢুকতে পেরেছিল।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে (বহুত্ব)
চিক্‌চিক্ করে বালি (অল্পার্থে - চকমক করার ক্ষুদ্র সংস্করণ)
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা (বিস্তৃতি)
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক (পৌনপুনিক)
তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাইবার কালে (বিস্তৃতি)
আষাঢ়ে বাদল নামে নদী ভর ভর (আসন্ন অর্থে)
আরো আছে-
ঘোলা জলে পাকগুলো ঘুরে ঘুরে ছোটে (যুগপৎ অর্থে, ঘুরছে এবং ছুটছে)
দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া (বিস্তৃতি)

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ব্যাকরণের উদারহণ তৈরি করার জন্য কবিতাটি লেখেননি। এসব মাস্টারমশায়দের আবিষ্কার। বরং 'সহজ পাঠ' -এর প্রথম ভাগটি যথাসম্ভব সহজ রাখবার প্রয়াস করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাক্যগঠন সরল, ঋজু। এ বই-এ পড়ুয়াদের যুক্তাক্ষরের পরিচিতি দেওয়া হয় নি, তার জন্য আছে দ্বিতীয়ভাগ, তাই গোটা প্রথমভাগ যুক্তাক্ষর বর্জিত। তবে খুঁটে খুঁটে ভুল বার করা বাঙালির অনেকদিনের অভ্যাস। সেই অভ্যাস বশেই তিপান্ন পাতার বইটিতে একটা যুক্তাক্ষরওলা শব্দ বার করে ফেললাম। দু'জায়গায় ব্যবহার হয়েছে শব্দটি। রবীন্দ্রনাথ হয়ত একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। এক জায়গায় আছে -''দিনে হই এক মতো, রাতে হই আর / রাতে যে স্বপন দেখি মনে কী যে তার!'' স্বপন দন্ত্য স-এ ব-এ-এ এ তো যুক্তাক্ষর, তাই নয় কি? অবশ্য এও হতে পারে, উচ্চারণের দিক থেকে যুক্তাক্ষরের ভাবটা নেই বলে রবীন্দ্রনাথ জেনেশুনেই স্বপনকে ছাড়পত্র দিয়ে ছিলেন।

স্বপন বা স্বপ্ন শব্দটিকে ছাড়পত্র দেওয়া কিন্তু সত্যি দরকার ছিল। সে রাতের স্বপন হোক বা জেগে জেগে আকাশপাতাল ভাবা দিবাস্বপ্নই হোক, স্বপ্ন 'সহজ পাঠ' -এর একটি মূল সুর। এই ছোট্ট দুটি বইতে, মানে 'সহজ পাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে একাধিকবার তিনি স্বপ্নের ছবি দেখিয়েছেন। ছোট একটি ছেলে - সে ইস্কুল যেতে ভালোবাসে না, তাই রাতে স্বপ্ন দেখে ... ''আমাকে ধরিতে যেই এল ছোটকাকা/ স্বপনে গেলাম উড়ে মেলে দিয়ে পাখা/ দুই হাত তুলে কাকা বলে থামো থামো/ যেতে হবে ইস্‌কুলে এই বেলা নামো/ আমি বলি কাকা মিছে করো চেঁচামেচি/ আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেছি।'' আর এক জায়গায় একটি শিশু মনের সাধ, মনের ইচ্ছে প্রকাশ করে বলছে - ''দেখি দূরের পানে/ মাঝ নদীতে নৌকো কোথায় চলে ভাঁটার টানে।... থাকি ঘরের কোণে, সাধ জাগে মোর মনে/ অমনি করে যাই ভেসে ভাই নতুন নগর বনে।''

এ এক ধরনের দিবাস্বপ্ন, তবে এর থেকেও জোরদার দিবাস্বপ্নের নিদর্শন বইটির শেষ চার লাইনে। ''আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার/ কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার।/ কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে/ কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে।''

দিবাস্বপ্ন গোছের এই ভাবটা প্রথম ভাগ ছাড়িয়ে দ্বিতীয় ভাগেও ছড়িয়ে আছে। ছোটছেলে তার মাকে নিয়ে বনবাসী হবার স্বপ্ন দেখছে। বলছে-

''বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে, আসবে না কেউ তোমার কাছে/ দিন রাত্তির কোমর বেঁধে থাকব পাহারাতে।/ রাক্ষসেরা ঝোপে-ঝাড়ে মারবে উঁকি আড়ে আড়ে, দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি/ ধনুক নিয়ে হাতে।''

কিংবা - ''মনে ভাবি ঐখানেতেই আছে রাজার বাড়ি।/ থাকত যদি মেঘে ওড়া/ পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া/ তক্ষুণি যে যেতেম তারে লাগাম দিয়ে কষে;''

এইসব কবিতাগুলিতে একটা উড়ুউড়ু ভাব আছে। আনমনা একটা বালকের ছায়া ঠাহর করা যায়, যে কল্পনায় রাজ্যে ঘুরে বেড়ায় সারাক্ষণ। এখন এই মুহূর্তে এখানে কী হচ্ছে, সে বাস্তবের সঙ্গে তার তেমন কোনো যোগাযোগ নেই।

ক্লাসভর্তি ক্ষুদে পড়ুয়ারা অক্ষর লিখতে পড়তে শিখছে, বানান শিখছে, বাক্য গঠন করতে শিখছে। তাদের মধ্যে এই আনমনা বালকটিকে আনা কি ঠিক হচ্ছে? ক্ষুদে পড়ুয়াদের মনোযোগ ব্যাহত হয় যদি! এ নিয়ে একটু বিতর্ক হতেই পারে, তবে একটা কথা- শিশু বয়সে মনে মনে কল্পনা করার ব্যাপারটা একটু মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলে ভালো ছাড়া খারাপ হবে না। চারপাশের চেনাজানা লোকদের ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, যাদের মধ্যে কল্পনা জিনিসটা একটুও নেই, তাদের জীবন কেমন যেন কাঠ কাঠ একটেরে। জীবনে বড় কিছু করতে হলে, পূর্ণাঙ্গ ভাবে বাঁচতে হলে, কল্পনা শক্তি থাকা

খুবই দরকার। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল...সেই উপলক্ষ্যে আইনস্টাইন বলেছিলেন- ''জ্ঞানের থেকে কল্পনা বেশি জরুরি।'' এই কথাটা মেনে নিলে সেই আনমনা ছেলেটিকে ক্লাসে ডেকে এনে সবার মাঝখানে বসাতে আপত্তি থাকে না।

দিবাস্বপ্ন, কল্পনাশক্তি এই সব অপেক্ষাকৃত ভারী আলোচনার ফাঁকে দ্বিতীয় ভাগের ঊনচল্লিশ পাতার কবিতাটি পড়ে নেওয়া যেতে পারে। এ কবিতার বিষয়ও স্বপ্ন। জানা কবিতা, পড়া কবিতা, শোনা কবিতা, তবু আরেকবার পড়তে ভালো লাগে ঃ

''একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
'চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো' বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা - কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।''

'সহজ পাঠ' নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' বইটির প্রসঙ্গ এবং তুলনা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। বর্ণপরিচয়টি বইটিতে (দ্বিতীয় ভাগ) কবিতা নেই, তবে যুক্তাক্ষর ও বানান শেখবার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট গদ্যরচনা আছে। এই সব পাঠের নীতিশিক্ষা আছে, আছে ছাত্রদের কর্তব্য কী তার স্পষ্টাস্পষ্টি বয়ান। 'বর্ণপরিচয়' -এর সুর এবং মেজাজ কিন্তু 'সহজ পাঠ' -এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মেজাজ - কড়া হেডমাস্টারমশায়ের মেজাজ। সুর যদি কিছু থাকে, তাহলে তা ধমকের সুর। যেমন 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে যাদব নামে একটা ছেলেকে আমরা দেখতে পাই। (পৃষ্ঠা - ১৯, চতুর্থ পাঠ)

''যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রতিদিন তাহাকে বিদ্যালয় পাঠাইয়া দিতেন। লেখা-পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে, এক দিনও, বিদ্যালয় যাইত না; পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

''বিদ্যালয় ছুটি হইলে, সকল বালক যখন বাড়ি যায়, যাদবও সেই সময় বাড়ি যাইত। তাহার পিতামাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া আসিল। এইরূপে প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।''

বলা বাহুল্য, এ জিনিস তো বেশিদিন চলতে পারে না! অভয় নামের একটি ছেলেকে দলে টানতে গিয়ে যাদব গেল ফেঁসে। অভয় সোজা গুরুমশায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে দিল, ধরা পড়ে গেল যাদব।

''গুরুমহাশয় যাদবের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ছেলে একদিনও পড়িতে আসে না। প্রত্যহ পথে পথে খেলিয়া বেড়ায়।...যাদবের পিতা শুনিয় অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন; বই, কাগজ কলম যা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি, তিনি যাদবকে ভালোবাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।''

যাদব যে দুষ্টুছেলে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্কুল পালিয়ে খেলে বেড়ানো অন্যায় তো বটেই! বিদ্যাসাগরমশায় তাকে এর জন্য জোর বকা দিয়েছিলেন, ক্ষমাও করেননি। কিন্তু এ ছেলে রবীন্দ্রনাথের সামনে পড়লে বোধহয় পার পেয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথ হয়ত প্রথমে যাদব কেন বই পড়তে চায় না তার কারণ খুঁজতেন। বলা যায় না, শেষে হয়ত যাদবকে মাফ করে দিয়ে নিজেই দোষ স্বীকার করে বলতেন- ''সে ত্রুটি আমারই/ থাকত ওর নিজের জগতের কবি/ তাহলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে/ ও ছাড়তে পারত না/ কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে/ আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।'' ('পুনশ্চ' থেকে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ছেলেটা'র শেষ কটা লাইন।)

এদিকে যাদবের তো পোয়া বারো! কবে তার সেই 'নিজের জগতের' ভবিষ্যত প্রজন্মের কবি এসে গুবরে পোকা, ব্যাঙ, নেড়ি কুকুর নিয়ে লিখবেন, সে বই ছাপা হবে, তবে না যাদব তার পড়ার মতো বই পাবে! ততদিন ছুটি, ইস্কুল যাবার দরকার নেই।

যাদবকে নিয়ে হাসি মস্করা ছেড়ে বলা যায়, বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন অনুশাসনহীন ছন্নছাড়া বালকের দল নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসুক, সংযত জীবনযাপন করার একটা তালিম পাক। যুগের প্রেক্ষাপটে তাই ছিল সবথেকে জরুরি। 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগের প্রথম প্রকাশ 'সংবৎ ১৯১২' অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। 'সহজ পাঠ' এসেছে ১৯৩০ সালে, মানে আরও পঁচাত্তর বছর পরে। ততদিনে অভিভাবকতার ধরণ ধারণ, বিদ্যালয়ের রীতিনীতিতে হয়ত কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্য আদলে বই লেখার একটি পরিসর পেয়েছিলেন। 'সহজ পাঠ' -এ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা অনুভব করা যায়, তার অভিনবত্ব এতদিন পরেও নজর এড়ায় না।

'সহজ পাঠ' -এর প্রকাশকাল আর 'পুনশ্চ'র মধ্যে - রচনাবলী খুলে দেখলাম- মাত্র দু'বছরের ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কমবেশি সত্তর। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় তাঁর নিজের শৈশব স্মৃতি আর বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঠশালার প্রচলিত হৃদয়হীন শিক্ষাপদ্ধতি মেনে না নিতে পারার ব্যথা, 'পুনশ্চ'র এই কবিতাটির মতো 'সহজ পাঠ' -এর স্বপ্ন দিবাস্বপ্নের মধ্যে সরাসরি না হোক প্রচ্ছন্নভাবে-যেন প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মৌলিক কিছু ধারণা ছিল। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা খোলামেলা ভাব আছে। তিনি সব সময় চেয়েছেন যে বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনে একটা মুক্তভাব আসুক। শুধু ইস্কুলেই নয়, বাড়িতে শিশুরা বদ্ধ আবহাওয়ায় বড় হচ্ছে, এতেও তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। 'সহজ পাঠ' -এর একটি কবিতায় ছোট একটি ছেলের জবানিতে তিনি বলেছেন -''কত রাতের শেষে/ নৌকো - যে যায় ভেসে/ বাবা কেন অপিসে যায়,/ যায় না নতুন দেশে?''

কল্পনা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে মনের মধ্যে খানিকটা উন্মুক্ত জায়গা করে নেওয়ার মন্ত্র 'সহজ পাঠ' - এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও এ বই বাস্তব জীবনধর্মী না বলে ভুল হবে। কখনো যুক্তাক্ষর শেখাবার ফাঁকে, কখনো গল্পের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ রেখেছিলেন।

যেমন তৃতীয় পাঠ (দ্বিতীয় ভাগ) 'ঙএ গএ' যুক্তাক্ষরটি অভ্যাস করানো হয়েছে। গোটা দশ বারোটি বাক্য আছে যাদের মধ্যে 'ঙ্গ' এর প্রাচুর্য ছাড়াও অন্য আরেকটি দিক লক্ষ্য করা যায়।

জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে তো বটেই, সাধারণ ভাবে ভালো থাকতে হলেও মানুষের মধ্যে, ইংরেজিতে যাকে বলে Planning and Organising ব্যাপারটি থাকা দরকার। কোনো একটি কাজ করার আগে যে ব্যক্তি একটু সময় খরচ করে

ঠিক করে রাখে কী করে বন্দোবস্ত করা হবে, তাহলে তার ফল ভালোই হয়। সত্যি কথা বলতে, একটু আগে থেকে পরিকল্পনা করে নেওয়া এবং সংগঠিত হয়ে কাজ করা, সাফল্যের একটি কারণ। আজকাল চাকরির ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ-র সময় বাজিয়ে দেখা হয়, ছেলেটি বা মেয়েটির মধ্যে এই গুণটি আছে কি না। যেমন হয়ত বলা হলো- ধরো, তোমাকে একটা গ্রামে পাঠানো হলো, সেখানে একটা ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করতে হবে। তুমি কীভাবে কাজটি করবে। সেরকম ইন্টারভিউ হলে কাগজ পেনসিল ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়, এক দুই তিন করে কাজের একটা তালিকা করে দেখাও।

'সহজ পাঠ' দ্বিতীয় ভাগের এগারো পাতায় তৃতীয় পাঠে ফিরে আসা যাক ঃ

''আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করার দিন। সব ছেলেরা দল বেঁধে যাবে। রঙ্গলালবাবুও এখনি আসবেন। সিঙ্গি, তুমি দৌড়ে যাও তো। অনঙ্গদাদাকে ধরো, মোটরগাড়িতে তাঁদের আনবেন। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল, কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি। আর নেবে ভিঙ্গি মেথরকে।''

সকলে মিলে একটা কাজ করতে যাচ্ছে, তার যোগাড় যন্ত্র হচ্ছে। এর মধ্যে ব্যবস্থাপনা করার পাঠ অবশ্যই রয়েছে। এরপর তেরো পাতায়, 'দন্ত্য নএ দএ' যুক্তাক্ষরটি নেওয়া হয়েছে। সেই জন্য জায়গার নাম চন্দননগর, চরিত্রের নাম আনন্দবাবু।

''চন্দননগর থেকে আনন্দবাবু আসবেন। তিনি পাড়ার কাজ দেখতে চান। দেখো, যেন নিন্দা না হয়। ইন্দুকে বলে দিও, তাঁর অতিথ্যে যেন খুঁত না থাকে। তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো। তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে। ... ঘর বন্ধ যেন না তাকে। সন্ধ্যা হলে ঘরে ধুনোর গন্ধ দিও।...বিন্দুকে বলে মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই।''

কিংবা ধরা যাক সপ্তম পাঠের লেখাটি। কোথাও যাবার কথা আছে, তাই আহারের ব্যবস্থা হচ্ছে।

'' বাজারে একটা আস্ত কাৎলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন, আর বস্তা থেকে গুন্তি করে ত্রিশটা আলু আনা চাই। এবার আলু খুব সস্তা। একান্ত যদি না পাওয়া যায়, কিছু ওল আনিয়ে নিও। রাস্তায় রেঁধে খেতে হবে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। মনে রেখো - কড়া চাই, খুন্তি চাই, জলের পাত্র একটা নিও।''

সাধারণ আটপৌরে কথা, বুঝতে অসুবিধে নেই। ক্ষুদে পড়ুয়া নিজে বানান করে করে পড়ে, অন্যের পড়া শোনা, খাতায় লেখা, বাক্যগঠন শেখে, যুক্তাক্ষর শেখে। তার সঙ্গে সঙ্গে শিশুমনে পাকাপাকি ছাপ রেখে যায় সকলে মিলে কাজ করার শিক্ষা, কাজের আয়োজন, কাজের পরিকল্পনা, কাজের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রাথমিক ধারণাটুকু। অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাই চেয়েছিলেন।

অনেকে মনে করেন, এমন কী মনোবিজ্ঞানীরাও বলে থাকেন, শৈশবের শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানবিকতাবোধ যদি শৈশবে না শেখানো হলো, তা হলে ভবিষ্যত জীবনে তা আর হয়ে উঠবে কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন ভাবে মানবিকতার কিছু প্রাথমিক পাঠ গল্পের মাধ্যমে শিশুদের সামনে রেখেছেন। যেমন প্রথমেই চোখে পড়ে পশুপাখির প্রতি ভালোবাসা। পশুপাখি ভালোবাসতে শেখা মানবিকতার একটি আবশ্যিক এবং প্রাথমিক ধাপ। যারা পশুপাখির কষ্ট বোঝে না বা বিনা কারণে কষ্ট দেয়, তারা মানুষকে অন্তর থেকে ভালোবাসবে, তা হতে পারে না। 'সহজ পাঠ' -এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে এ প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে। প্রথম ভাগের চৌত্রিশ পাতায় - ''কুল পেড়ে খাব। কুলগাছে টুনটুনি বাসা করে আছে। তাকে কিছু বলি নে।'' কিংবা চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পাতায় - ''ঐ যে ওর পোষা গাধা। ওর পিঠে বোঝা। ...গাধা ছোলা খেতে ভালোবাসে। ওকে কিছু ছোলা খেতে দাও।'' অথবা দ্বিতীয় ভাগের ত্রিশ পাতায় একটু সূক্ষ্মভাবে এ প্রসঙ্গ এসেছে। ''উল্লাস, তুমি যাও তো, কুকুরের বাচ্চাটা বড়ো চেঁচাচ্ছে, ঘুমোতে দিচ্ছে না, ওকে শান্ত করে এসো।'' উল্লাসকে যদি শুধু বলা হতো, কুকুরের বাচ্চাটা বড়ো চেঁচাচ্ছে, ঘুমোতে দিচ্ছে না, তাহলে সে হয়ত গিয়ে এক মোক্ষম লাথি ঝেড়ে কৃষ্ণের জীবটিকে পালাতে বাধ্য করতো। ছোটরা যাতে এই ধারণাটা না শেখে, তাই তিনি বলেছেন-''ওকে শান্ত করে এসো''। এর থেকেও সূক্ষ্মতর একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়ছে ঃ প্রথম ভাগ থেকে-

''পাখি কি ওড়ে ? না, পাখি ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি। ও আগে ছিল বনে। বনে নদী ছিল, ও নিজে গিয়ে জল খেত। দীনু এই পাখি পোষে।''

ব্যাস, আর কিছু বলেননি রবীন্দ্রনাথ। বন্দী পাখির ব্যথা শিশুর মনে কি প্রতিস্থাপিত হবে? হবে কি হবে না তা জোর করে বলা যায় না। তবে যদি তা হয় তাহলে যে শিশুটি সারা জীবনে কখনো পাখিদের কষ্ট দেবে না বা খাঁচায় ধরে রাখবে না, তা হলফ করে বলা যায়।

দ্বিতীয় ভাগের একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ পাঠে তিনটি পূর্ণাঙ্গ গল্প আছে। প্রথমটি, মানে একাদশ পাঠেক গল্পটি বাঘ শিকারের। শক্তিবাবু আর আক্রম গিয়েছিল শিকারে। বাঘ দেখা গিয়েছিল প্রচন্ড বিপদও হয়েছিল, কিন্তু শেষমেশ বাঘ শিকার হয়ে ওঠেনি। সকালে উঠে ওরা জঙ্গলে পথ হারালো যখন, তখন কাঠুরিয়ার দল তাদেরকে যত্ন করে খেতে দিল, পথ দেখিয়ে দিল। গল্পটির মধ্যে যে একটা রোমাঞ্চ আছে। সমাপ্তিটুকু মধুর। তিন নম্বর গল্পটি একটু জটিল গল্প। এতে আছে সে যুগের সামাজিক অবিচারের কথা, সেই সঙ্গে আছে বৃদ্ধা কাত্যায়নী দেবীর মহত্ব। গল্পটির মুখ্য চরিত্র উদ্ধব মন্ডল। গরীব লোক। তার কন্যা নিস্তারিনীর বিবাহ। উদ্ধব রাত্রি থাকতে উঠে পদ্মপুকুর থেকে একটা বড় রুইমাছ ধরে বাড়ি আনবার উপক্রম করছে, এমন সময় জমিদার দুর্লভবাবুর লোক তাকে এসে ধরল। এ পুকুরে সাধারণ লোকের মাছ ধরা কয়েকদিন হলো দুর্লভবাবুর আদেশে বন্ধ হয়ে গেছে, তা উদ্ধবের জানা ছিল না। তার ওপর সেদিন দুর্লভের ছোট কন্যার অন্নপ্রাশন- উদ্ধবের এত বড় সাহস যে সে আজ মাছ ধরেছে! উদ্ধব কয়েদ হয়ে গেল। ছাড়া পাওয়ার জরিমানা দশ টাকা, তা উদ্ধবের কাছে নেই। এখন কী হবে? কাল যে তার কন্যার বিবাহের দিন! দুর্লভের পিসি কাত্যায়নী দুর্লভকে ডেকে বললেন, ''বাবা, নিষ্ঠুর হয়ো না। উদ্ধবের কন্যার বিবাহে যদি অন্যায় করো তা হলে তোমার কন্যার অন্নপ্রাশনে অকল্যাণ হবে। উদ্ধবকে মুক্তি দাও।'' দুর্লভ পিসিমার কথা কানেই নিল না। তখন কাত্যায়নী উদ্ধবের জরিমানার দশটি টাকা দিয়ে উদ্ধবকে মুক্ত করলেন। এর পরে গল্পের রূপকথার মতো একটি মোড় আছে। গোধুলি লগ্নে বিবাহ। বেলা চারটের সময় পাঁচজন বাহক উদ্ধবের বাড়ি এসে মাছ, দই, সন্দেশ সব দিয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা তো অবাক। কে পাঠাল এসব? বাহকেরা কিছু না বলে চলে গেল। তারপর পালকি করে এলেন কাত্যায়ণী ঠাকুরণ। তিনি একগাছি সোনার হার আর একশ টাকা দিয়ে উদ্ধবের মেয়েকে আশীর্বাদ করলেন।

বাঘশিকার আর কাঠুরিয়া এবং উদ্ধব আর কাত্যায়ণী - দুটো গল্পই পড়তে ভালো লাগে। সম্ভবত শিশুদেরও ভালো লেগে থাকে। আতিথেয়তা, পরোপকার, অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে ন্যায় এবং মহত্ব, এই ধরনের নীতিশিক্ষা রবীন্দ্রনাথ গল্পচ্ছলে আনতে চেয়েছেন। এ সব মেনে নিয়েও বলতে বাধা নেই যে, দ্বাদশ পাঠের বিশ্বম্ভরবাবুর গল্পটি বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। একটু ছোট করে গল্পটি শোনা যাক।

বিশ্বম্ভরবাবু ডাক্তার। পালকি চড়ে রোগী দেখতে চলেছেন অনেক দূরে। একটি ছেলের অম্লশূল, বড় কষ্ট পাচ্ছে। পালকির বাহক ছাড়া সঙ্গে লাঠি হাতে চলেছে বিশ্বম্ভরবাবুর অনেক দিনের অনুচর শম্ভু। শম্ভুর শরীরে অসাধারণ শক্তি, লাঠি চালাতে ওস্তাদ। যৌবনে যে একবার একটা ভাল্লুক মেরেছিল শুধু লাঠি দিয়ে। বিষ্ণুপুরের পশ্চিমে প্রকাণ্ড মাঠের ধারে যখন পালকি এল, তখন সন্দে হয় হয়। এক রাখাল গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিল, তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল - সপ্তগ্রাম অনেক দূর। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীষ্মহাটের মাঠ, তার কাছে শ্মশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।

ডাক্তার বললেন - বাবা, রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।

পথে মড় মড় করে পালকির ডান্ডা গেল ভেঙে, বিশ্বম্ভরবাবু শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন। এমন সময় বেহারাদের সর্দার বুদ্ধু এসে বললে - ''ঐ যে কারা আসছে...''। যা ভয় করা গিয়েছিল তাই হলো। ডাকাত পড়ল। দলে তারা পাঁচজন। এদিকে বিপদ দেখে বেহারারা পালিয়েছে। বিশ্বম্ভরবাবু বললেন - শম্ভু! শম্ভু বলল - আজ্ঞে!

— এখন উপায় কী?

শম্ভু বলল - ভয় নেই, আমি আছি। ডাকাতেরা অট্টহাসি হেসে এগিয়ে এল। কিন্তু শম্ভু সহজ পাত্র নয়। লড়াই -এ তিনজন ডাকাত আহত হয়ে পড়ে গেল, দুজন গেল পালিয়ে। বিপদ কেটে গেল।

এইখানেই গল্প শেষ হতে পারত, কিন্তু হয়নি। বিশ্বম্ভরবাবু ডাকলেন - শম্ভু!

শম্ভু বলল - আজ্ঞে।

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন - এইবার ডাক্তারী বাক্সটা বের কর।

শম্ভু বলল - কেন, বাক্স নিয়ে কী হবে?

- এই তিনটে লোকের ডাক্তারী করা চাই। ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।

রাত তখন অল্পই বাকি। বিশ্বম্ভরবাবু আর শম্ভু দুজনে মিলে আহত ডাকাতদের শুশ্রূষা করলেন। গল্প শেষ হলো এতক্ষণে।

বিদ্যার্জন আর শিক্ষালাভের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিদ্যার্জন মানে যদি হয় ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদির তথ্য ও প্রয়োগ শিখে নেওয়া তাহলে শিক্ষালাভ হলো জীবনের পথে কীভাবে চলতে হবে তা আয়ত্ত করা। এ প্রসঙ্গে আর একবার আইনস্টাইনের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন, ''ইস্কুল - কলেজে শেখা অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সমস্ত ভুলে যাবার পর যা বাকি থাকে, তা হলো শিক্ষা।'' এটি সেই ধরনের একটি বাক্য যা পড়ার বা শোনার পর থমকে যেতে হয় কয়েক মুহূর্ত, যতক্ষণ না এর অর্থ প্রবেশ করে যায় মনের গভীরে।

জঙ্গলের ভেতরে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই-এর ধুন্ধুমার কান্ড ভুলে গেলেও, শেষ অঙ্কে বিশ্বম্ভরবাবুর সেই ডাক্তারী বাক্স খোলার শব্দটি যদি ছেলেমেয়েদের মনে থেকে যায়!

প্রথম ভাগের তিপান্ন আর দ্বিতীয় ভাগের ষাট, সাকুল্য একশ তেরো। তার মধ্যে অনেক পাতার অর্ধেক জমি জুড়ে ছবি। বড় বড় অক্ষর, ছাড়া ছাড়া লাইন - কতটাই বা লেখা! তবু যতবার পাতা ওল্টানো যায় ততবারই কিছু না কিছু অংশ নতুন করে নজর কেড়ে নেয়। যেমন স্টীমারঘাট নিয়ে একটা কবিতায় মাত্র পাঁচ-ছ লাইন খরচ করে আঁকা সে কালের বাঙালিবাবুর প্রায় নিঁখুত ছবি।

''কলিকাতা হতে আসে বঙ্কু শ্যামদাস
অম্বিকা অক্ষয় : নতুন চীনের জুতো
করে মসমস্, মেরে কনুইয়ের গুঁতো
ভিড় ঠেলে আগে চলে; হাতে বাঁধা ঘড়ি
চোখেতে চশমা কারো, সরু এক ছড়ি।
সবেগে দুলায়।''

কিংবা হয়ত দু-একটা মন কেমন করা লাইন। ''বেলা হলো। মাঠ ধূ ধূ করে। থেকে থেকে হু হু হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে।''

'সহজ পাঠ' এখন আর ইস্কুলে চলে কি না কে জানে! ইস্কুল ব্যাগের ভেতর বই -এর ঘষা খেয়ে মলাট ছিঁড়ে যাওয়া 'সহজ পাঠ' বইটি আর নেই। তার জায়গায় বইমেলা থেকে কেনা 'সহজ পাঠ' - এর নতুন কপি যতটা পারা যায় যত্ন করে তাকে রাখা হয়েছে। সে বই-এর মধ্যে আছে কাঠুরিয়া সর্দার, আছেন কাত্যায়ণী দেবী, আছেন বিশ্বম্ভর ডাক্তার। আর আছে ফাটল ধরা ভাঙা মন্দিরের দালানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লেজ - কাটা কুকুর। বইমেলার স্টলে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। এক অপরকে চিনতে একটুও সময় লাগেনি। সে যেন বলেছিল - 'আমি তো এখানেই আছি রে, তুই - ই তো এতদিন কোথায় চলে গিয়েছিলি'!